IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

‘চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা’ পেরিয়ে ‘দহনগাথা’ শুনি : কবি মানবেন্দ্রনাথ সাহা

[Beyond ‘Choukathe Nishiddho Alpana’ –Listening to ‘Dahangatha’ : The Poetries of Manabendranath Saha]

পায়েল হালদার

পি এইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মানব জমিনে ঘর বেঁধেছেন এক সহজ কবি। তাঁর ঘরে অবিরাম ভাবনাদের আনাগোনা। ভাবনারা কখনো ‘মেধের মতন মেয়ে কুয়াশা’ সেজে ভেসে চলেছে সহজ সারল্যে। আবার কখনো বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে অভিমানের কালো বোরখা পরে। কবির ঘরে বসত করে একরাশ ভাব ও ভাবনা। তাঁর ঘরের চৌকাঠে সেই ভাবেরই আলপনা। কবি সে আলপনাকে ঘোষণা করেছেন ‘নিষিদ্ধ’ বলে। কিন্তু নিষেধের গণ্ডি যেখানে, সেখানেই যে নিষেধ খণ্ডনের আকস্মিকতা ! চৌকাঠ পেরিয়ে যায় পাঠক।

লোকে বলে কবিরা ভুলোমনা। কবিদের মন মোটেই সংসারি নয়। কিন্তু এ হেন কথায় শিলমোহর দেওয়া গেল কই! এক কবিকে দেখেছি। তিনি যে বরাবর সাক্ষ্য রেখেছেন মনে রাখার। মনে রাখা দিয়েই তার সমগ্র সৃষ্টি। নস্টালজিক মননের গাঢ়তায় ডুবে থাকেন কবি, ডুবুরি হয়ে যাত্রা পথে সামিল করান পাঠককে। চিত্রকল্প, চরিত্র, সময়, পরিবেশ সব নিয়ে বড় মায়াময় জগৎ তাঁর। কিন্তু সেই কবি রচনাকে জানার আগে জানা প্রয়োজন ‘কবি কে?’ ‘শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন’ তিনিই কী কবি? তা হয়ত নয়। তবে কবি কে?

কবি কে?

‘that everyone feels sometimes
but someone feels many times...’
[‘Life On a Floating Boat’
-Musfiq Us Shaleheen]

ছন্দ, অলংকার, শৈলী –লেখনীর এই বাহ্যিক পারিপাট্য বা Concept গুলিকে ছাপিয়ে গিয়ে চেতনে বা অবচেতনে ‘কবি’র যে ছায়া দেখি তাঁকে গতে বাঁধা কী যায়? কবি কে?-এই এক বড় প্রশ্ন। ‘কবি’ শব্দের সংজ্ঞায় পাওয়া গেল –‘A person who has the gift of poetic thought, imagination, and creation, together with eloquence of expression.’[১] কিন্তু এই ‘poetic thought’-এর জন্মই বা কোথায়? শোনা যায় কত কত যুগ আগে কোনো এক আফ্রিকান কৃতদাস কান্না করে খোল বাজিয়ে ঈশ্বরের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেছিল। তার সেই কান্নার সুরেই নাকি গানের অবির্ভাব। অথচ এ ঘটনার কোনো সাক্ষ্য নেই। জীবনের বাস্তবতা জমতে জমতে ঠিক কবে বিশালকায় মহাকাব্যের জন্ম হয়েছিল তারও হদিশ মেলেনি। তবে হয়ত একদিন প্রাচীন পৃথিবীর আদিতম কোনো এক পাহাড়ি ঝড়নার ঝংকার, সমুদ্রের গম্ভির কলধ্বনি, কালো মেঘেদের আর্তনাদ বা ঝড়ের মুখে দাবানলে তপ্ত গাছেদের শিরশির শব্দ থেকে ভেসে এসেছিল এক বিস্ময়কর সুর। আর কোনো এক আদি মানব শুধু যে তা কান পেতে শুনেছিল তাইই নয়, সেই সুরের বাস্তবতার মর্মে পৌঁছেছিল সে। তা নাহলে এমন ধ্বনি-খেলার শুরু হল কীভাবে? সেই আদি মানব ছন্দ কী তা বোঝেনি। অলংকার কী তা চেনেনি। শৈলীর ধার ধারেনি। তাঁর বুকে নাড়া দিয়েছিল অদ্‌ভুত এক আবেগ, ব্যকুলতা, আকুতি। এমন সব অনুভুতি থেকেই জন্ম নিয়েছিল যে সত্তা তাঁরই নাম ‘কবি’।

কোনো বিশেষ তত্ত্বের ভিত্তিতে 'কবি' শব্দের বিচারে যাওয়া মূল্যহীন। কারণ 'কবি' শব্দের মহিমা অসীম অনুভূতিতে ও উপলব্ধিতে নিহিত। কবি নিজেই সৃষ্টি হয়েছেন অদ্ভুত রোমান্টিসিজিমের গর্ভ থেকে। সেখানে চেতনার কোনো গণ্ডি নেই। সরল জীবন দর্শনের মধ্যে দিয়েই অকুতোভয় কবি নির্মমতার জঠর থেকে সত্যকে আবিষ্কার করেন। জীবনানন্দের ভাষায় 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি, কবি, কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে, এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয় ; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়–'[২] । প্রসঙ্গত বাস্তবিক কবিকে চেনাতে হলে ভাবনায় আনা যায় বনফুলের 'নিমগাছ' গল্প বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসের কথা। 'নিমগাছ' গল্পের অতি সামান্য পরিসরে কবির চরিত্র স্বমহিমায় স্বতন্ত্র। সেখানে কী সরল দৃষ্টি দিয়ে কবি আবিষ্কার করেন নিমগাছের বাহার- 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরণের লোক এল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙ্গলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠলো, 'বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলো.....কি রূপ। থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার....এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ–' খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।' কবিরাজ নয়, কবি'[৩]। নিমগাছের প্রতিকের অন্তরালে যে লাঞ্ছনাময় গৃহবধুর জীবন রইল, বলা বাহুল্য কবি তাকে নতুন করে আবিষ্কারই শুধু করলেন না, আপন মনের মাধুরীতে সাজিয়ে উচিত সম্মান দিলেন। এখানেই কবির সামাজিক দায় বর্তাল। আবার 'কবি' উপন্যাসের কবিয়াল 'নিতাইচরণ' চরিত্রটির কথাও যদি ভাবা যায় তাহলেও দেখা যাবে ডোমের ছেলে নিতাই কিন্তু সত্যই পোয়েট হয়েছে। অন্ত্যজ শ্রেণির একজন হয়েও সে ডাকাতি বৃত্তি নিতে পারেনি, সে হয়েছে কবি। কালো বলে লাঞ্ছিত ঠাকুরঝিকে ভালোবেসে পদ রচনা করেছে –'কাল যদি মন্দ তবে চুল পাকিলে কান্দ কেনে?' লঘু চালে হলেও সামাজিক রুচিবোধের অবক্ষয়িত রূপের প্রতি কবির এ প্রতিবাদ নয় কী? আবার শেষে যখন সে জেনেছে তাঁর গ্রাম ছাড়ার পর ঠাকুরঝি তার শোকে পাগল হয়ে মারা যায়, তখন তাঁর প্রাণ কেঁদেছে। সমগ্র জীবন নিংড়ে মানব জীবনের শূণ্য সারমর্ম বুঝে সে বলেছে 'জীবন এত ছোট ক্যানে?' প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নিয়ে কত ক্ষুদ্র মানুষের জীবনের পরিসর। একথা তত্ব জ্ঞানহীন অন্ত্যজ শ্রেণির এক কবিয়াল 'নিতাইচরণ' উপলব্ধি করেছে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সৃষ্টি সুখে মেতে ওঠা আর জীবনের অন্তর্দর্শন থেকে প্রাপ্ত এমন উপলব্ধি বা সত্য ভাবনাতেই তো কবি জীবনের স্বার্থকতা। আসলে কবিদের অন্তরে থাকে –

'অনেক তিয়াষে করেছি ভ্রমণ,
জীবন কেবলই খোঁজা।
অনেক বচন করেছি রচন,
জমেছে অনেক বোঝা।'

['স্ফুলিঙ্গ' ,শঙ্খ ঘোষ]

-এই 'খোঁজা' আর 'বোঝা' নিয়েই চলমান কবি জীবন। তেমনই এক কবিকে পাওয়া গেল কবিতার আসরে। তিনি কবি মানবেন্দ্রনাথ সাহা। নব্বই এর দশকে আত্মপ্রকাশ ঘটল তাঁর। 'নিতাইচরণ' এর শেষ উক্তি 'জীবন এত ছোট ক্যানে?' এর মতন তিনিও বললেন –'ভালোবাসার জন্য যেন/ একটি জীবন যথেষ্ট নয়, / দু'চারটে জীবন পেলে/ রাত্রি ছেনে আলো বানায়'। 'কবি'র বোধ নিয়েই তিনি যে 'কবি' তাতে আর সন্দেহ কী ! কবি নিজের ভাষ্যে পাওয়া গেল কবি হিসেবে তাঁর দায়বদ্ধতার কথা- 'আধুনিক সময়ের কবি হিসাবে আমার দায়িত্ব কবিতাকে আরো বেশি করে পাঠকের কাছে নিয়ে যাওয়া। সহজ আভরণের মধ্য দিয়ে কবিতাকে সংকেতিত করে তোলা। পপুলারিটির উপাদান সযত্নে সরিয়ে পাঠককে একটু ভাবতে সাহায্য করা। কবিতায় ছ্যাবলামো চর্চার মধ্য দিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা পাবার বিরুদ্ধে অবিরাম বলে চলা। কবি সামাজিক জীব। সমাজের মধ্য থেকেই কবিতার নিষেক ঘটে। আলাদা করে সমাজ ভাবনার কবিতা লেখার টান অনুভব করি না'।

কবি এলেন, কবিতা এল

১৯৬৫ সালের ৩০ নভেম্বর, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে কবি মানবেন্দ্রনাথ সাহার জন্ম। পিতা শ্রী আনন্দগোপাল সাহা ও মাতা শ্রীমতি রেণুকা সাহা। এনাতুলিবাগের বাসগৃহে কেটেছে কবির শৈশব থেকে কৈশর। আটের দশকে মাষ্টারমশাই শ্যামল রায় ও পিতা আনন্দগোপাল সাহার কবিতা তাঁর কবিতা লেখার প্রথম অনুপ্রেরণা। সমসাময়িক শঙ্কর ভট্টাচার্যের কবিতাও খুব প্রিয় ছিলো কবির। ১৯৮১ সালে ক্লাস ইলেভেনে তাঁর প্রথম কবিতা, 'সুনয়নার জন্য' প্রকাশিত হয় 'কবিকন্ঠ পত্রিকায়। ক্রমে 'উপহার' ও 'বহুমুখী' পত্রিকার পাতাও তাঁর কাব্যগুণে অলংকৃত হয়েছিল। এরপর বহু লিটিল ম্যাগাজিন, পত্রিকা একাধিক স্থানে প্রকাশিত হয়েছে কবির অসংখ্য কবিতা। কবির আরো এক পরিচয়, বর্তমানে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তবে এই পেশাদারি শিক্ষক সত্তাকে ছাড়িয়ে কবি মানবকে চেতনায় আনব তাঁর দুই কাব্য গ্রন্থের পাঠকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে।

[১]

...'কার বৃত্তে ফিরে যাবো আমি? তোর অসমবয়সী বন্ধু।
সবদিকে পুঞ্জিত যন্ত্রণা – ডাকুক আয়ত চোখ, চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা'।...

সালটা ১৯৯৮। রেনুকা'জ প্রভা প্রকাশণী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় কবি মানবেন্দ্রনাথ সাহার প্রথম কাব্য গন্থ 'চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা'। পাঠক পেল বাহান্ন পাতার মনমুগ্ধকর উপহারের ডালা। এ কাব্যের উৎসর্গ স্থানে লিখেছেন –'মেধের মতন মেয়ে কুয়াশাকে –/ কাছে থাকো, ছুঁয়ে থাকো'। আবার তার নিচের অংশে বলেছেন-

'আগুন আমি আগুন ভালোবাসি,
শীত-গ্রীষ্ম পোহাই তার আঁচ
আমায় কেন হিম অস্ত্র দিলে?
কুয়াশা, তোমার বর্ম প্রত্যাশী'

-এ এক অদ্ভুত 'Contrast'। চেতনা শক্তিতে কাজ করছে চমকপ্রদ বৈপরীত্য। একদিকে শীতল কুয়াশার মত নারীর কাছে প্রত্যাশা আর অন্যদিকে আগুনকে ভালোবাসা। আসলে কবি হয়ত মেধের আগুনের মত পবিত্রতা চেয়েছেন নারীর স্নিগ্ধ শীতল প্রেমে। কাব্যের শুরুতেই শব্দের এমন সাংকেতিক প্রয়গ নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

এর পরে নয় থেকে বাহান্ন পাতার প্রতিটিতে একটি একটি করে রয়েছে আটত্রিশ খানা কবিতা। প্রতিটি কবিতারই মর্মে রয়েছে প্রেম। তবে শুধু প্রেম নয়, আছে নর নারীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইতিবৃত্ত, অদ্ভুত সব মানবিক বিকার, কবির নস্টালজিক মনন এবং শব্দে আঁকা দারুণ কিছু চিত্রপট। কবির চেতনে নারী আছে বহুরূপে- 'মেয়েরা আমার কবিতার প্রধান বিষয়। তাদের প্রেম ও আকৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল'। তবে শুধু প্রেমে নয় ,অপ্রেমে, অভিমানে, তিরস্কারেও রয়েছে নারী। এই সমস্ত দৃষ্টিকোণগুলিকে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নির্বাচিত কিছু কবিতার আঙ্গিকে ভাবা যাক –

'চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা' কাব্যের প্রথম কবিতা-

'রূপের থেকে লাফিয়ে ওঠে তোমার অহং। অন্ধকারে
বুঝতে পারি অরূপরতন দেয় যে ফাঁকি। সর্বনাশী –
সুদর্শনা, এমনি ক'রেই গিয়েছ ভুলে গোপন রাজা।
স্বপ্ন দেখায় যে ছেলেটি তার চোখেতে ঘুম ছিল না
তিরিশ বছর –
কারণ তোমার অসুখ হ'লে ক্লান্ত বিকেল বিষাদকাতর।
নিঃশব্দেই শহর জানায়, সখী তোমার ঘরবন্দী
রূপজমুখ, বাসি কাগজ, শব্দরঙ্গ, না পড়া বই।
স্বপ্ন দেখায় যে ছেলেটি আজ বিকেলে সে আসেনি
সন্ধ্যা নামে রাত বাড়ছে সে আসেনি, নিজের অসুখ
পোড়ায় তাকে, তুমি তো তার খোঁজ রাখনি!'

[এক অসুখের জন্য]

কবি নারীর নিষ্ঠুর রূপের কথা বলতে বলতে প্রেমিকের কন্ঠে দিলেন নিদারুণ অভিমানের সুর, প্রেমের বহ্নিতে তপ্ত পুরুষের আবেগে নারী হল তিরস্কিত। তবে এখানেও আবার পাওয়া শব্দের চমৎকার 'Contrast' –'সর্বনাশী- সুদর্শনা'। এরপর 'নিঃশব্দ বালিকা' কবিতায় এল আরো দুই নারীর কথা। এদের একজন 'মা' আর একজন 'নিঃশব্দ বালিকা'। একজন নারী পরম নির্ভরতার খুঁটি আর একজন নারী নিঃশব্দে প্রেমিকের মনে মুগ্ধতা ছড়ানো সরল মায়াজাল - 'নিঃশব্দ বালিকা তুই তোর হাতে ছিল জীয়ন কাঠি আর মরণের ফাঁদ'। তাকে অতিক্রম করা শক্ত। ফাঁদে পড়তেই হয় কারণ 'আমি তো সিদ্ধার্থ নই'- সত্যই সিদ্ধার্থের মত ত্যাগি পুরুষ কজন আছে? এমনই মানব মনের টানাপোড়েনের খন্ড চিত্র রয়েছে সমগ্র কাব্য জুড়ে। 'হৃদয়ের ভাই-বোন' কবিতায় রয়েছে মোহ ভঙ্গের স্পষ্ট সতর্কতা –'মুগ্ধতার অবসান কেটে গেলে থাকে শুধু নম্রনীল রাত'। 'নষ্ট হতে কষ্ট হয়' কবিতায় কবি প্রশ্ন তোলেন মূল্যবোধের, ঋণ স্বীকার করতে শেখান ভালোবাসার কাছে। 'ফাল্গুনদিনের গান' কবিতার শেষ দুই চরণে রয়েছে রূপে নয় ভালোবাসায় ভোলানোর কথা-'রূপে নয় রাজা তোকে ঘিরে রাখে অরূপে / আমাদের কাছে জীবন অনন্য'।এ কাব্যের সব চেয়ে আশ্চর্যতম কবিতা 'ছ'জন প্রাক্তন প্রেমিকের গল্প'। কবিতাটির শৈলী অনন্য। ছ'জন পুরুষের জীবনের খন্ডচিত্র এঁকে নারীকে রাখলেন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে –

‘সুমিত – নারী হত্যাকারী !
কৌশিক – নারী স্বতন্ত্র বেদনা !
জয়দীপ – নারী রক্ত মাংস !
সঞ্জয় – নারী নিষিদ্ধ পরকীয়া !
সন্দীপ – নারী আকাশ-গংগা !
অরুণাভ – নারী জলতরঙ্গ, নারী কাঞ্চনজঙ্ঘা’।

-গল্প মেশানো কাব্যিক আশ্রয়ে পুরুষের চোখে নারীর এমন মূল্য নির্ধারন অবশ্যই চমতকারিত্বের দাবি রাখে। তবে শুধু নারীকে দেখা নয়, কবি চেতনার তুলিতে একেঁছেন নাগরিক জীবনের ব্যস্ততায় ঘটে চলা খুব সাধারণ কিছু চিত্রপট। সেখানে পাঠককে মুগ্ধ হতে হয় নস্টালজিয়ার গন্ধে। রৌদ্র ছায়ার স্মৃতি নিয়ে কবি রচনা করেন ‘মিথ্যে দুপুর’ –‘কাঁঠাল বনে ভালোবাসার সারা দুপুর / সাক্ষী ছিল দু’টি লাল সাইকেল’। ‘কষ্ট যখন’ কবিতায় পাওয়া গেল সমব্যাথি প্রেমিক হৃদয়ের দুশ্চিন্তা –‘সারা দুপুর বৃষ্টি হ’লো / মেঘ কাটেনি, মেঘ কাটেনি/ ঝড়ের মতো তোমার যাওয়া/ লাগেনি ভালো লাগেনি’। ‘সিনেমা তোর সংগে যাবো’ কবিতায় দির্ঘ সময়ে অপেক্ষারত প্রেমিকে দেখা যাচ্ছে – ‘আসছি’ বলে সেই যে গেল উধাও আকাশ / টিকিট হাতে দাঁড়িয়ে আছি পঁচিশ বছর’! তার ভাষ্যেই নস্টালজিয়ার পথ ধরে হেঁটে যায় পাঠক –‘তোকে দেখবো /ঊনিশ বছর, রূপের স্মৃতি, পালানো দুপুর/ তোর জন্য মিথ্যে বলা কাগজ ফাঁকি’। ‘পালাচ্ছো নৈহাটি’ কবিতায় এক প্রেমিকাকে দেখা গেল, যে প্রেম আর সামাজিকতার টানাপোড়েনে দ্বিধান্বিত। অবশেষে সত্য থেকে তার পলায়ন –‘তৃতীয় প্রেম সুযোগ পেলেই পাশাপাশি হাঁটি/ সর্বনাশের কাছে রেখে পালাচ্ছো নৈহাটি’। এ কাব্যের সবচেয়ে দীর্ঘতম নস্টালজিক কবিতা ‘নীতাদি’। প্রেমের বৈধতা অবৈধতার Concept – কে ভেঙে নতুন মাধুর্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন কবি এ কবিতায়। প্রৌঢ়া নীতার কাছে প্রেমিকের প্রাপ্তি কিছুই নয়, মুগ্ধতা ছাড়া –

‘নীতাদি, বয়স বেড়েছে জেনে যে নারী
বড় বেশি স্থির থাকতে চেয়েছে
তাকে জীর্ণতা এসে ডাকে না !
ভয় এসে হাত ধরে না !
রক্তস্রোতে পলিমাটি জমে না !
...
শহর তোমাকে বিস্ময়ে দেখে
উদভ্রান্ত মানুষ দেখেছে কত বছর !
তোমাকে দেখেছি আমি বাইশ বছর’।

‘চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা’ কাব্যের উনিশ সংখ্যক পৃষ্ঠা এবং শেষ বাহান্ন সংখ্যক পৃষ্ঠায় ‘দোলদুপুরের দিনগুলি’ নাম্নি দুটি পৃথক কবিতা রয়েছে। কবিতা দুটির মর্মে সেই একই নস্টালজিয়া-

‘তোর মনে পড়ে ইন্দ্রনীল হৈ হৈ দুপুরের দিনগুলো?
জলা পুকুরের মাছরাঙা হ’য়ে ঝাঁপাই পেটা, ডুব সাঁতারে
...
তারপর ভেজা পায়ে চুপি চুপি ঘরে এসে
সেকী তোর কান্না। অকৃতজ্ঞ আমি, বড় হ’য়ে জেনেছি
তোর ফুসফুসে ছিদ্রকথা।
[‘চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা’,পৃ,১৯]

কিংবা

‘তোর মনে পড়ে কুয়াশা, ছেলেবেলায় গ্রামের বাড়িতে
জোর ক’রে তোকে সাজিয়েছিলাম দোলে, অবুঝ তুই
...
এইবার দোলে আমি গ্রন্থহীন পাতা, আর তুই হারানো খোয়াই
মনে আছে কুয়াশা, কথা ছিল উৎসব-বসন্তে যাবো
শান্তিনিকেতন, কাঁকড়ের, পলাশের বালিতে শোব
প্রাণের আরামে। এইবার কার অপরাধে রঙহীন
এই দোলে ঘরবদ্ধ শুধু একা থাকা ?
এইবার দোলে আমি গ্রন্থহীন পাতা’।
[‘চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা’,পৃ, ৫২]

-বন্ধুত্ব আর আর ভালোবাসার আবহে কী চমৎকার স্মৃতিচারণ। বন্ধুত্বের প্রতি আজীবনের দায়কে স্বীকার করা আর বিরহতাপিত কণ্ঠে ভালোবাসাকে মনের চিলেকোঠায় আগলে রাখা –এই দুই অনুভুতিতে কবির নস্টালজিক মনন স্বার্থক।

'চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা'কাব্যের শুরুতেই জানা যায় কবি আগুন ভালোবাসেন। প্রসঙ্গত 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'পতঙ্গের' প্রবন্ধেরর কথা ভাবনায় আসে। সেখানে মানুষ রূপি পতঙ্গেরা 'রূপ বহ্নি', 'ধন বহ্নি', 'মান বহ্নি' কত রকমের বহ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, কমলাকান্তের ভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কবি মানবেন্দ্রনাথ সাহার কবি চেতনাতেও সেই একই ধারার মানবিক বিকার ও প্রতিকারের খোঁজ় চলে অন্ধকারে রংমশালে আগুন জ্বালিয়ে। সেই আলোর পথ ধরেই চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়া যাক। চৌকাঠ পেরোলেই শোনা যাবে আরো কত দহনের আকুতি।

[২]

'...শরীরে রেখেছি বিষ, যুগান্তের বিপন্ন-বিষাদ,
আমাকে দিয়েছ বর্ম নষ্ট হ'তে কষ্ট পাবো কেন? '

২০০০ সালের জানুয়ারিতে কলকাতা বই মেলায় কবিতার ফেরিওয়ালা হয়ে 'চতুরঙ্গ' ফেরি করে গেল এগারো পাতার 'দহনগাথা'। মূল্য দশ টাকা মাত্র। কিন্তু দহনের মূল্য নির্ধারণ কী এতই সহজ? আজ ২০২১ এ একুশ বছর বয়সের সদ্য তরুণ হয়েছে 'দহনগাথা'। তবু এগারো খানা পাতায় যেনো এগারো শতাব্দীর দহনের ধোঁয়া উড়ছে। যেন সুপ্রাচীন কাব্য খানা! মানব কবি তাতে যে উষ্ণতা ছড়িয়ে রেখেছেন তা কখনোই শীতল হওয়ার নয়। কারণ সে দহন আদি কাল থেকে বয়ে আসা আদি মানবের অন্তর্দহন –

'গাছের উপর ঝরে অনাদিকাল দুঃখের বৃষ্টি
শিকড় জানেনি তার রং-রূপ অভিমানী মন'
['দহনগাথা',২]

কবি কাব্যটি নিবেদন করেছেন দুই নারীকে – তাঁরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান মনস্ক নারী রোকেয়া বেগম ও জ়নৈক শ্রীমতি রতি চক্রবর্তী। তবে রতি চক্রবর্তী নামটি কোনো ইঙ্গিতবাহি কিনা তা নিয়ে পাঠকের কৌতহল জাগে। মৎসপুরাণ অনুসারে প্রজাপতি রাজা দক্ষের কন্যা রতি বিবাহ করেছিলেন কামদেবকে। তিনি হিন্দুদের প্রেম, লিপ্সা, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা এবং যৌন পরিতৃপ্তির দেবী। 'হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে রতির সৌন্দর্য ও যৌনক্ষুধা সংক্রান্ত উল্লেখ রয়েছে৷ বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁকে প্রেম ও কামের দেবতাকে পুলকিত করার জন্য সৃষ্টি হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে৷ ক্রোধে শিবের কামদহন কালে কামদেব তথা নিজের স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য রতিদেবী তাঁর কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানিয়েছিলেন৷ শিব তাঁকে বর দেন যে তার স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন রূপে আবার পৃথিবীতে জন্ম নিলে আবার কামদেবের পুনরুত্থান ঘটবে৷ রতিদেবী মায়াবতী নাম নিয়ে জন্মলাভ করেন ও প্রদ্যুম্ন বাল্যকালে পিতামাতার - থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাঁকে লালনপালন করে এক সমালোচনাপূর্ণ ভূমিকায় উত্তীর্ণ হন'। পুরাণ প্রসিদ্ধ এই নারীর জীবনে দহনগাথার সুর অবশ্যই আছে। সেই সুরেই কী কবির কল্পলোকে 'রতি চক্রবর্তী'র আবির্ভাব? সে প্রশ্ন অজ্ঞ পাঠককের অবচেতনে উঁকি দেয়।

এ কাব্যেরও শুরুতে কবি লিখেছেন – 'প্রত্যয়ার্পণ করো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অন্বেষণ রাখে
দস্তয়ভস্কির মন। ভাসমান জুয়াড়ি পুরুষ
দার্শনিক নারীর বন্ধু। ক্ষীর নদী বর্ণাঢ্য বিকেলে
পুড়ে যাচ্ছে সংরাগ, বিনির্মিত দহনগাথা।'

কাব্যের শুরুতেই বিষদের সুরে মানব কবি স্বরণে আনছেন প্রিয় পাশ্চাত্য কবি দস্তভয়েস্কিকে। দস্তভ্যেস্কিরা মত প্রেমিক চিত্ত চায় প্রেম, স্পর্শ, আগলে রাখবার অংগিকার। কিন্তু সাহসে ভর দিয়ে ভালোবাসার খাঁচায় পাখিটা ভাংতে পারে না খাঁচা। চলতে থাকে শুধুই শ্রদ্ধা বা দায়বদ্ধতার মিছে খেলা। দীর্ঘদিন সময়ের খেলায় পর সত্যই দস্তভয়েস্কিরা ঘরের ভিতর একটা সত্যিকারের ঘর খোঁজেন। চলতে থাকে প্রেমিক পুরুষের দহনগাথা। চলেতেই থাকে।

ভুমিকার পর শুরু হয় মূল কাব্য। প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, স্মৃতি, বিষাদ ও আগুনে পোড়া অনুভুতি নিয়ে রচিত হল কবির 'দহনগাথা'। তাঁরই কিছু স্মৃতিতে আনা যাক -

' সমুদ্র যেভাবে ভাঙে বালির সমগ্র তটভূমি
আমাকে ভেঙেছ তুমি বারবার সহজ সারল্যে
সেইজন্য কষ্ট বেশি। ও সম্পর্ক সব জটিলতা
অভিসার শেষ হলে আজ হ'য়ো না বিপথগামী'।
[৫ সংখ্যক]

-দারুণ এক উপমার ব্যবহার হল। সশব্দ সমুদ্র..অথচ কী সরলতায় করে চলে ক্ষয়কার্য। কিন্তু একদিকে ক্ষয় হয় বলেই আরেকদিকে সৃষ্টি হয় ভালোবাসার দ্বীপ। সে দ্বীপেই অভিসার হয় অহরাত্র। সেখানেই কবির জন্য বনলতা কিংবা সুচেতনারা করে অপেক্ষা। বিপথগামী হবে কার সাধ্যি?

‘ দূরে মন্দিরের চূড়া শঙ্খচিল আকাশে নীলাভ
ঝাউগাছ কেটে ফেলে হোটেল গড়ছে পুরোহিত।
মঠ থেকে ভেসে আসে চৈতন্যভাগবতের সুর
দেবদাসী নাচ হবে সন্ধ্যার আরতি শেষ হলে’।

[৯ সংখ্যক]

নস্টালজিক কিছু মুহূর্তের অনুভুতির সাথে এক সরলরেখায় গাঁথা রইল সবুজ নিশ্চিহ্নকরনের বিষাদ -'দূরে মন্দিরের চূড়া শংখচিল আকাশে নীলাভ ঝাউগাছ কেটে ফেলে হোটেল গড়েছে পুরহিত।' 'পুরহিত' শব্দিটা খুব তীর্যক।

‘অন্ধকারে ছড়িয়ে আছে সমান্তরাল রেললাইন
আমরা দুজন নদীর ধারে হেঁটে চলেছি দ্রুত
বারোমাসের দুঃখকথন আপাতত ভুলে
এঁকে রাখছি আকাশজুড়ে আলোর একটি ছবি।’

[১৫ সংখ্যক]

'অন্ধকারে ছড়িয়ে আছে সমান্তরাল রেললাইন..'-আরো একটা প্রতিকী। সত্যিই প্রেম অনেকটা ভাগ অংকের মত। একটা ভাগফল যে পাওয়াই যাবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পৌনপুনিক বা ইনফিনিটি একটা ভাগশেষ থেকে যেতেই পারে। তাই শেষ হয়েও হইল না শেষ। দহনগাথা নিয়েই আবার আলোর পথ ধরতেই হবে।

‘শরীরে উত্তাপ নেই, অর্গল খুলে শহর গেছে
বনে অভিসারে! আর চতুর্দিকে কান্নাময় আমি
কিশোরবেলার গন্ধ কোথায় হারালো চঞ্চলতা?
সফলতা নষ্ট করে গতিহীন সমস্ত আবাদ’।

[১৭ সংখ্যক]

কৈশরবেলার সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক.. মন যে আজোও কৈশর কাটাতে পারেনি। পারে না। ঘরের ভিতর ঘরের মতন মনের ভিতর আরেকটা শিশুমন ঘাপটি মেরে থাকে।

‘শহর মাতাল করে কেন ছেড়ে গেছি বনবাসে?
লালমাটি ছুটে এসে মাদল বাজায় সারারাত।
বাউলের পায়ে নাচে জোৎস্নারাতের রেলগাড়ি
যদি তুমি দুঃখ দাও হয়ে যাব ময়ূরাক্ষী নদী’।

[৭ সংখ্যক]

' লালমাটি ছুটে এসে মাদল বাজায় সারারাত / বাউলের পায়ে নাচে জ্যোৎস্না রাতের রেলগাড়ি..' খুব আকস্মিক একটা রোমান্টিসিজিম। পরমুহূর্তেই দহন গাথা -'যদি তুমি দুঃখ দাও হয়ে যাব ময়ূরপাক্ষী নদী।' বেদনা দুঃখ নিয়েই ভোলা বাউলের আনন্দ।

‘আমি তো দুঃখ চাই নি, তবু সব বৃষ্টি অনাবৃত
রৌদ্র ঢাকে অন্ধকারে, কষ্ট দেয়,আড়াল রাখে না।
নিজেকে চেনালে বলো পাপময় জন্মান্তর হবে?
বরং জরুরি আজ হৃদয়ের পোশাক পাল্টানো!’

[২০ সংখ্যক]

'...তবু সব বৃষ্টি অনাবৃত' -সত্যিই তক বৃষ্টি অনাবৃত। তবে কান্না ঢেকে দেয়। 'জরুরি আজ হৃদয়ের পোশাক পালটানো।'-হৃদয়ের পোশাক পাল্টালেও হৃদয় থেলে অভিমানের রঙ মোছে না। বিস্ময়!

‘গাছের উপর ঝরে অনাদিকাল দুঃখের বৃষ্টি
শিকড় জানে নি তার রং-রূপ অভিমানী মন।
আত্মহত্যার দড়ির মতো কলঙ্কের সাঁকো ঝোলে,
ঝোলে অপচয় প্রেম, হৃদয়ের সমস্ত দহন।’

[২]

আত্মহত্যার দড়ির মত কলঙ্কের সাঁকো ঝোলে/ ঝোলে অপচয় প্রেম হৃদয়ের সমস্ত দহন'- এর প্রেক্ষিতে হঠাৎ যে গান গাইতে ইচ্ছে হয়- ' ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর..'

কাতর করা চিত্রপট রইল কিছু –

‘নসরত ফতে আলি শোনাচ্ছে গান ঐ 'আফরিন...'
মুঠো ভরে উঠে আসে সুফি বাউলের সখ্য প্রেম।
নির্গত বীজের রক্ত গাছ হয় শিকড়ে শিকড়ে
শিশুর আপন কান্না সুর ঝরে হয় একতারা’।
[৪৬ সংখ্যক]

‘চিল্কায় এবার কোনো পাখির মেলা বসেনি রৌদ্রে
হ্রদের সমস্ত জল আকাশের নীল হারিয়েছে।
নৌকাগুলি কার স্পর্শে প্রাণ পেয়ে জলযান হবে?
দূরে ত্রিশূল মন্দির দেখে চমকে উঠলে তুমি’।
[৪৭ সংখ্যক]

‘কার তারে ঝোলা শাড়ি শুষে নিচ্ছে দুপুরের রোদ?
ফেরিওলা কড়া নেড়ে পণ্যের দেবতা রেখে যায়।
ঘুমহীন দিনান্তের ঘোরে দৌড়ায় বর্ধমান লোকাল
শূন্য প্ল্যাটফর্মে আমি একা থাকি উদ্বাস্তু অন্তরে’।
[৪১ সংখ্যক]

‘বাতিঘর থেকে কেউ 'হ্যালো' বলছে না,
অমানিশা অন্ধ রাতে পুরীর আকাশে ঝরে সব
মৃত নক্ষত্রেরা, দূরে মন্দিরের ঘন্টা বাজে।
পাখি মরে পড়ে আছে নুনের বালিতে নামহীন’।
[৩৬ সংখ্যক]

নসরত ফতে আলি খানের কনটেমপোরারি সুরের সাথে বাউল সুরের ককটেইল নেশার ঘোরে অদ্ভুত মায়াবী রোমান্টিসিজম।

চিল্কার ফাঁকা সমুদ্রতট..সচল জীবনের লহরী চান। 'ত্রিশূল' শব্দটা বেশ প্রতিকী। আসলে সত্যিই নতুন শুরুর আগে তো প্রলয় নাচন চাই।

মহানগরীর দুপুরজীবন..রোজনামচার নিয়মেই চলছিল। কিন্তু কবির মনে সহজাত সদা ব্যাকুলতা..অধীর প্রতীক্ষা হয়ত বনলতা বা সুচেতনা বা শ্বাশ্বতি'র জন্য।

এক একটা চরন এক একটা চরনকে কী দারুণ ভাবে ব্যাঞ্জনা দিচ্ছে..'অমানিশা অন্ধ রাতে পুরির আকাশে ঝরে সব মৃত নক্ষত্ররা, দূরে মন্দিরে ঘন্টা বাজে।/ পাখি মরে পড়ে আছে নুনের বালিতে নামহীন।.. কী অদ্ভুত বৈপরীত্য...দারুণ ক্রিটিসিজিম।

‘দহনগাথা’ কাব্যে কবিতাদের নাম নেই। কবি তাদের পরিবেশন করেন খন্ড খন্ড চিত্রপটে। কাব্য গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটের পিঠে লেখা রয়েছে-‘‘...‘দহনগাথা’ যেন এক জীবন অনুভবের বর্ণোময় চিত্রলিপি। অনুভূত জীবন-নির্যাস এখানে দহনের স্তোত্রের মত ধরা পড়েছে”। সত্যই মন্ত্রমুগ্ধকর স্তোত্রের মালা ‘দহনগাথা’। যার কোন ধর্ম নেই অবিরল ভালোবাসা ছাড়া ...সেই এক সরল সন্নাসীর বেশেই কবি গেয়ে যান দহনগাথা। পাঠক কল্পলোকে শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বোধি বৃক্ষের তলে।

আকর গ্রন্থ :

১। মানবেন্দ্রনাথ সাহা, ‘চৌকাঠে নিষিদ্ধ আলপনা’, রেনুকা’জ প্রভা প্রকাশনী, ভবানী দত্ত লেন-৭০০০৭৩।
২। মানবেন্দ্রনাথ সাহা, ‘দহনগাথা’, ‘চতুরঙ্গ', কলকাতা-৭০০০০৬।

তথ্য সূত্র :

১। https://www.dictionary.com/browse/poet
২। বুদ্ধদেব বসু , জীবনানন্দ দাশ, কবিতা পত্রিকা ১৩৪৫, বৈশাখ,প্রবন্ধ- ‘কবিতার কথা’।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বনফুল, ‘বনফুলের শেষ্ঠ গল্প’, বাণীশিল্প, কলকাতা-৭০০০০৯।
২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কবি উপন্যাস’, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।